- : তৃতীয় অধ্যায় : -

রূপকের ঐতিহাসিক পটভূমি - প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ।

'' প্রাচীন যত ধর্মগ্রন্থ রহিয়াছে সেখানে রূপক ব্যতীত ধর্মালোচনা কোথাও জমিয়া উঠে নাই । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যাহাই হৌন , মানুষ তাঁহার সহিত নিজেদের যত রকম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সকলেই মানবীয় প্রেমের উপমা লইয়া ।''[১]

যদিও এই উক্তিটি প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তবু অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলেও দেখতে পাই । সেখানেও রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার অনর্গল ও অফুরন্ত । এসকল রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার কোথাও কবির সচেষ্ট উদ্যোগের ফল, কোথাও তাঁর শিল্পকর্মের স্বভাবজাত ।

আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন দেখা দেবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রূপক - কাব্যধারা প্রতীচ্যের allegory - কাব্যের প্রভাব সঞ্জাত কিনা । আপাততঃ সেই প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা স্থগিত রেখে আমরা লক্ষ্য করি যে রূপকের ব্যবহার যেহেতু মানুষের একটি বিশ্বজনীন প্রবণতা এবং কবিরা যেহেতু ভাবকে রূপ দিতে গিয়ে দেশে দেশে কালে কালে রূপক অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন হয়ত সেই কারণে বাংলা সাহিত্যের আদিমধ্যযুগে কবিদের রচনায় আমরা রূপক অলংকারের সুপ্রচুর উদাহরণ পাই ।

বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নে আলোআঁধারির সন্ধিক্ষণে ৮৪ জন সিদ্ধার কণ্ঠে যে ভোরের কাকলী জেগে উঠেছিল — তাই চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ।

১। ডঃ শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত । উপমা কালিদাসস্য, ১৩৬৩ , পৃ - ৩১ ।

চর্যাপদ বৌদ্ধসহজিয়া সাধকদের সাধন সঙ্গীত। সেকারণেই গূঢ়ার্থবহ। তত্ত্ব-উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত আচ্ছাদিত করেছেন বাহ্য অর্থের অবগুণ্ঠনে। অর্থাৎ রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে চর্যাসিদ্ধাগণ। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, '' এই ধরণের চর্যায় এমন বহু শব্দ ও উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার আছে যাহার দুইটি করিয়া অর্থ - একটি অর্থ সাধারণের জানা, অপর অর্থটি চর্যাকর্তাদের সাধনার পরিভাষিক যেন তাঁহাদেরই প্রাইভেট্ কোড্''।[২] এই গূঢ়ার্থ এবং বহিরঙ্গ অর্থ পাশাপাশি থকে বলেই চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' ভাষা বলা হয়ে থাকে। '' সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝাযায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম কথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে।''[৩]

চর্যাকারগণ তাঁদের সাধনতত্ত্বকে গূঢ়ার্থবহ করতে উপমা সংগ্রহ করেছেন তৎকালীন সমাজের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্মাদি থেকে। সেকালে মদ তৈরী হত কেমন করে, শুঁড়িরবাড়ী চেনা যেত কিসে, খরিদ্দার কেমন করে মদের দোকানে প্রবেশ করত, লাউযন্ত্রের সাহায্যে নৃত্যগীত করত ইত্যাদি প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রতিবিম্বপ্রায় খণ্ড খণ্ড প্রতিরূপ উপমান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাহ্নের একটি চর্যায় (১০ নং) ডোমের জাতিবৃত্তি — তাঁতের কাজ, চাঁরি বোনা ও নৌকা বাওয়ার এবং কাপালিকের নটবৃত্তির উল্লেখ আছে।

'' অন্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগ তা
ডোম্বের অন্তরে ছাড়ি নড - পেড়া''॥ ইত্যাদি।

২। ডঃ সুকুমার সেন। চর্যাগীতি পদাবলী, ১৯৭৩, পৃ - ৩০।
৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৩৬৬, পৃ - ৮।

ভুসুকুর- একটি পদ —

''নিসি অংধারী মুসা আচারা ।
আমিঅ - ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥'' (২১ নং)

মূষিকের বিচরণ এবং বিবিধ মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ এই ছবির সাহায্যে চর্যাকবি বলতে চেয়েছেন চঞ্চলচিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হলে রূপাদি বিষয়সমূহে সতত বিচরণ করে বোধিচিত্তকে বিনষ্ট করে ফেলে ।

এরূপ রূপকের ব্যবহার চর্যাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে । এখন প্রশ্ন হলো রূপকের ব্যবহার সার্থক হয়েছে কি না ?

উপমার মধ্যে উপমান ও উপমেয়ের যে বস্তুগত ও ভাবগত দূরত্ব রূপকে তা অপসারিত হয়ে বস্তুরূপ ও ভাবরূপ ঘনীভূত হয়ে ওঠে । অর্থাৎ রূপক নির্মাণের জন্য একটা উপমান সংগৃহীত হলে তা উপমেয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কেবল তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না বরং উপমেয়কে আত্মসাৎ করে আপন সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত করে তাকে এক অভিনব রূপ দান করে । কিন্তু চর্যাগীতি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিশেষ একটি উপমেয় বস্তুর সঙ্গে বিশেষ একটি উপমান বস্তুর সাদৃশ্য সন্ধান নেই । প্রকরণের পর প্রকরণ সাজিয়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় রূপ - কে তাঁরা রূপকের আড়ালে গোপন করতে চেয়েছেন । চর্যাকার হয়ত বুঝেছিলেন রূপগোপন ক্রিয়াই রূপকের ধর্ম । রূপক যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে এ বোধ হয়ত তাঁদের স্পষ্ট ছিল না । পক্ষান্তরে বলা চলে গুহ্য যোগসাধনার অনুযায়ী করতেই চর্যাকার সজ্ঞানে রূপকের রূপগোচর ক্রিয়াকে অস্বীকার করে কেবল রূপ গোপন ক্রিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন । রূপগোপন করার সীমাই যেহেতু তাঁদের ধ্যানের আনন্দ ছিল সেকারণে তৎকালীন সমাজের তুচ্ছ নীচ সাধারণ

জীবনের ক্রিয়াকর্মাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চর্যাকবি সাধনতত্ত্বরূপ উপমেয়কে আচ্ছাদিত করেছেন এইসব উপাদানের আড়ালে। তাই নৌকা বাওয়ার সমগ্র রূপককর্মটি এবং চিত্রপারম্পর্য (৮ নং চর্যা) একত্রে চর্যাকারের সাধন পদ্ধতির পারম্পর্যটিকে ইঙ্গিত করেছে। অনুরূপভাবে হরিণশিকার, গৃহস্থালীতে ইঁদুরের উপদ্রবের ছবি, দাবাখেলার রীতিধারা ইত্যাদি খণ্ডচিত্র রূপকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে চর্যাগীতিকায়।

রূপক ব্যবহারের মধ্যে সন্ধান রূপবৈরাগ্যই যে চর্যাকারের উদ্দেশ্য কয়েকটি পদের ঘনিষ্ট আলোচনায় তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভুসুকু রচিত ''অধরাতি ভর কমল বিকসিউ'' পদটি চর্যাকারের ভোগবৈরাগ্যের একটা বড় পরিচয়।
কবি বললেন — " অধরাতি ভর কমল বিকসিউ

বেতিস, জোইনী তসু অঙ্গ

উহলসিউ।" (২৭ নং)

অর্ধরাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধতায় কিরণে কমল যেমন নিজেকে পূর্ণরূপে ভরিয়ে নিয়ে বিকসিত হয়ে ওঠে তেমনি বত্রিশ যোগিনীর সঙ্গে অঙ্গবিলাসে কবির চিত্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছে। অর্ধরাত্রে প্রস্ফুটিত কমল - দর্শনের আনন্দের ন্যায় এরূপ শারীরিক উল্লাস এক বিরলতম সুখবস্তু। কবি যেন এক মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে এই সুখ অনুভব করেছেন, কিন্তু বস্তুজীবন সম্পর্কে এই গভীর আসক্তিবোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।
পরমুহূর্তেই কবি ঘোষণা করলেন,

'' অবধূতী - মার্গে চিত্ত - চন্দ্র চলি যায়,
সহজ বলি' ছি আমি গুরুর কৃপায়।''

জীবন সম্বন্ধে এই নিবিড়তম কল্পনা এবং উপভোগের এমন একান্ততম আসক্তিকে পরাজিত

করে মধ্যাকের যোগ কবির ভোগের উপর জয় ঘোষণা করল । পদের শেষছত্রে কবি জানালেন, '' সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ ।।''

গুণ্ডারীপাদের '' তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী '' চর্যাটি এ পর্যায়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ । কবি বললেন ——

'' জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি ।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ।'' (৪ নং)

তোমার মুখ চুম্বনে কমলরস পানের আস্বাদন পেলাম —— কবি যেন একমুহূর্তের জন্য যোগবিরত হয়ে দাম্পত্যজীবনে লালায়িত চিত্ত-খানিকে চুম্বনে আসক্ত রেখেছিলেন । কিন্তু যোগসিদ্ধ চিত্ত চুম্বনে মূর্ছাতুর রইলো না অধিকসময় । কেননা বোধিচিত্তের দর্শন পেতে হবে —— সেই আচরণই চর্যাকারের উদ্দেশ্য ——

'' সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল ।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল ।। (৪ নং)

কুক্কুরী পাদের রচনা, '' দুলি দুহি পিটা ধরণ জাই ।'' পদটিতে কবি যোগসাধনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তৎকালীন সমাজের এক গোপন ব্যাভিচারের ছবি এঁকেছেন ।'' দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ।।'' (২ নং)

দিবসে যেবধূটি ভয়ে সদা ভীত হয়ে কাঁদে সেই রাতে কামে প্রীত হতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় । সমাজের এই বিশেষ চর্যা (আচরণ) গ্রহণ করেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব যেখানে অপরূপ এক আধ্যাত্মিক আনন্দে মুখরিত সেখানে চর্যাকার জীবনে এই ভোগের অবকাশটি তাঁর নির্জন যোগসাধনার অভিযানে উপেক্ষা করেছেন । তাই মনে হয় নিরাসক্ত ভোগ -

- বৈরাগ্য চর্যারচয়িতাকে এ রূপকটিতে কবি - কর্মের এক অপূর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে ।

''কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস'' পদটিতে ভুসুকু হরিণ শিকারের রূপক গ্রহণ করেছেন । কিন্তু এ রূপকের উপাদানগুলো সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ সে কারণে উপমেয়ের স্পষ্টতা, চারুত্ব কিম্বা ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারে নি । অথচ সমস্ত কবিতাটির মধ্যে রূপের এমন এক তড়িৎ প্রবাহ রয়েছে যা এ রচনাকে অভিনব কাব্যগুণে মণ্ডিত করতে পারত । হরিণ ও হরিণী উভয়ে শারীরিক উপস্থিত থেকেও ক্রমশঃ অবয়বের নষ্ট করতে করতে লীন হয়ে গেছে ।

'' তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই ।'' এই পদটির আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় Metaphysical - কবি John Donne - এর কৃতিত্বের সঙ্গে ভুসুকুর কৃতিত্বের সমজাতীয়তা লক্ষ করেছেন । তিনি লিখেছেন, ''Metaphysical - কবিতা রচনায় কবি John Donne - যে কৃতিত্বের অধিকারী, সমস্ত চর্যাগানে এমনকি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একমাত্র সে জাতীয় কৃতিত্বের সমকক্ষতা করতে পারতেন ।''[৪] সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন, '' সে তীক্ষ্ণ মননের বলে বাস্তব জীবনের সাধারণীকৃত ভাবগুলি Conceit - এ দানা বেঁধে ওঠে ভুসুকুর তা ছিল না ।''[৫] John Donne - নারীপুরুষের প্রেম সম্পর্ক বোঝাতে কম্পাসের দুটি কাঁটার কথায় রূপক এঁকেছেন, ''

'' If they be two, they are two so,
As stiff twin compasses are two,
Thy soule the fixt foot, makes no show
To move, but doth, if th' other doe." [৬]

এ ধরণের নিখুঁত Conceit - ভুসুকুর আলোচ্য চিত্রটির মধ্যে না ফুটলেও ভাবুকতার একটা সমজাতীয়তা লক্ষ করা যায় উভয় কবির মধ্যে। তবে Donne - এর রচনায় মননশীলতা ব্যাপারটি যেমন কবিগুণে ভূষিত হয়ে উঠেছে বারবার তেমন কোন কৃতিত্ব

৪। ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী । বাঙলা কাব্যের উপমালোক, ১৩৬৫, পৃ - ১৭ ।
৫। ঐ
৬। John Donne / Avalediction ; forbidding mourning.

ভুসুকুর রচনায় বেশী দেখা যায় না ।

চর্যাগানে রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার সর্বত্র একথা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছি । চাটিল পাদের '' নদী - সাঁকো'' চর্যার ' ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী' পদটি (৫ নং), লুই এর ' কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' পদটি (১ নং), সোণে ভরিতী করুণা নাবী' (৮ নং পদ), ' নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' (১০ নং পদ), ' সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী' (১৭ নং পদ), ভুসুকুর ২১ নং পদ, ' নিসি অন্ধারী মুসা আচারা,' ২৮ নং পদ ' উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী' — ইত্যাদি রূপকের দ্বারা আচ্ছন্ন । কিন্তু একদিকে যেমন বক্তার কথিয়ে দিয়ে একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রূপসৃষ্টি করার অন্তর্ভেদী আগ্রহ অনুপস্থিত এসব চর্যাপদগুলোর তেমনি উপমানগুলি নিত্য পরিচয়ে জীর্ণ হওয়ায় সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয় । অবশ্য এ মন্তব্য করার সময় একথাও স্মরণ করা কর্তব্য যে প্রায় দুহাজার বৎসর পূর্বের এই কবিদের চোখে এই সব উপমান বহুলাংশে সজীব ছিল, যদিও নিত্য ব্যবহারে আমাদের কাছে সেগুলি অনেক পরিমাণে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে । যাইহোক, তবু একথা প্রমাণ সাপেক্ষ যে কোথাও কোথাও চর্যাকারগণ কতকগুলো অবাস্তব ঘটনার প্রহেলিকা যানাকে' রূপক' হিসেবে ব্যবহার করে সহজসাধনার ও সহজানুভূতির আভাস দান করেছেন । ফলে সহজ বক্তব্যের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু পর্যন্ত ব্যাহত হয়ে বক্তব্য গূঢ় প্রহেলিকাময় হয়ে উঠেছে । ৩৩ নং চর্যা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । যথা -

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী,
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ।।

বেগঁ সঙ্গার বড়হিল জায় ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ।।
বলদ বিআয়ল গবিআ বাঁঝে ।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ।।
জো সো বুধী সোধ নিবুধী ।
জো সো চোর সোই সাধী ।।
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে সম জুঝয় ।
ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝয় ।।"

ডকটর সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলীতে উল্লিখিত ষোড়শ শতাব্দীর কবি কবীরের ভণিতায় অনুরূপ কয়েকটি পদ আছে । যথা :—

" মূষকী নাও বিলাই কাঁড়ারী
সোএ মেডুক নাগ পাহারী ।
বলদ বিয়াএ গাভী বই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাও এ দিন তিন সাংঝা
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জন বুঝে ।।"

উপরিউক্ত পদ দুইটিতে প্রতিবেশীহীন টালিতে ঘর, ভাতহীন হাঁড়ি, নিত্য অতিথির আগমন, বলদ, গাভী, বাছুর, চোর, সাধু, শৃগাল, সিংহ, মূষিক, বিড়াল সবকটি উপমানই সাধনতত্ত্ব বিষয়ক এক একটি উপমেয়ের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেছে — এদিক থেকে রূপক । কিন্তু তত্ত্বকে আচ্ছাদিত করার প্রতি অত্যাধিক আগ্রহ থাকায় -

রূপক সৃষ্টির দ্বারা সৌন্দর্য সংস্কার প্রয়াস ব্যাহত হয়েছে।

চর্যাগীতিগুলি সম্ভবত : সাহিত্য সৃষ্টির জন্য রচিত হয়নি, এগুলি ধর্মসাধনার উপজাত এক সৃষ্টি. গূঢ় ধর্মসাধনাকে গূঢ়ার্থবোধক ভাষায় বিন্যস্ত করে রচয়িতারা একমাত্র দীক্ষিতের কাছেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন এর গূঢ় অর্থ। ফলে রচনাগত সৌন্দর্য সৃষ্টি তাঁদের অভিপ্রেত বা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এই সাধকেরা কেউ কেউ যেহেতু কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন সেই কারণে এই রূপকাশ্রিত পদগুলি অনেক সময় সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠেছে। চর্যাকার' সন্ধ্যাভাষার' মাধ্যমে উপমাগুলোকে অস্পষ্ট দ্যোতনায় মণ্ডিত করেছেন সত্য — কিন্তু কোন কোন চর্যায় যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তার আবেদন ভাষা ও শব্দকে অতিক্রম করে একটা অলৌকিক মাধুর্যের আভাস প্রদান করে। '' সোণে ভরিতী '' ইত্যাদি ৮ নং চর্যা এবং'' উঁচা উঁচা পাবর্ত ইত্যাদি ২৮ নং চর্যা বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণ করে। ৮ নং চর্যাটির অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের আবেদন এত স্পষ্ট যে শিক্ষাচার্য মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ' সোনারতরী' কবিতার সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। রবীন্দ্র নাথ লিখেছেন,

'' গাঁই নাই মাঁই নাই জোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে সে ভরি।'' (সোনারতরী)

চর্যাকারও যেন এই ভাবনায় ভাবিত,

'' সোণে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিকে ঠাবী।''

সবশেষে একথা বলা চলে পরবর্তীকালে ধর্মাশ্রয়ী যে গীতি সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে চর্যাপদ নিঃসংশয়ে তারই পূর্বসূরী।

প্রাচীন বাংলা কাব্যকে অতিক্রম করে এসে মধ্যযুগের কাব্যে পদার্পণ করে যে কাব্য পেলাম তাহলো - 'বৈষ্ণবপদাবলী' — যার মূল ব্যাপারটিও রূপক । রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্ত ও ভগবানের প্রেমলীলার রূপক । মুহম্মদ আবদুল হাই মহাশয় বলেছেন, ''বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ একটি রূপক ছাড়া আর কিছু নয়। রাধা জীবাত্মা আর কৃষ্ণ পরমাত্মা । পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার আকুতি চিরন্তন । বৈষ্ণবরা নির্বস্তুক 'আমি ও তুমি'-র সম্পর্কের অবলম্বনে পরমাত্মা ও জীবাত্মার লীলারস আস্বাদন করেননি । তাঁরা এই 'আমি' ও 'তুমি'র স্থানে রাধা ও কৃষ্ণের রূপকের মাধ্যমে হৃদয়বৃত্তির চর্চা করেছেন ।''[7] অমলেন্দু বসু লিখেছেন, ''রাধাকৃষ্ণের প্রেম - কাহিনীতে মিলল বাঙালীর প্রেম ভাবনার ধ্রুব রূপক । স্ব - নামে, স্ব - রূপে যে প্রেম ব্যক্ত হয়নি, তার নিষেধ শঙ্কাহীন প্রকাশ পেলাম এই সর্বজন গ্রাহ্য রূপকে । দেবতার প্রেম আসলে হল মানুষ - মানুষীর প্রেম । আর বৈষ্ণবযুগের নব্যন্যায় শিক্ষিত, বিশ্লেষণপটু, রস শাস্ত্রবেত্তা, মার্জিত কবি নরনারীর প্রেমের কত না সূক্ষ্ম ও সুকুমার রূপের সন্ধান পেলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে ।''[8] তিনি এই বিষয়ে নিজস্ব মত ব্যক্ত করে বলেছেন, ''প্রেম কাব্যের এত পরিমার্জন ও নিয়ন্ত্রণ এমন বহুপল্লব প্রকাশ ইউরোপের মধ্যযুগীয় কাব্যেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, আমি অন্তত পাইনি ''রোমান্ দ্য লা রোজ'' - এ অথবা পেত্রার্কের কাব্যে ।''[9] ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় 'হৃদি - বৃন্দাবনে যদি' প্রবন্ধে বলেছেন -'' রূপক সর্বদাই অন্তর্বস্তুদ্যোতক । রূপকের ক্ষেত্রে কাজেই ব্যাখ্যার দৃষ্টি ভঙ্গী, পটভূমি এবং বিচারের উপকরণ ভিন্ন ধাঁ ধরণের । সেখানে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নয়, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহও নন, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ যে প্রকৃত বা বিষয় অর্থাৎ উপমেয় তার রূপিত বা উপমা

৭। গোলাম মুরশিদ । বৈষ্ণবপদাবলী প্রবেশক, মুখবন্ধ – আবদুল হাই ।

৮। অমলেন্দু বসু। সাহিত্য চিন্তা, ১৩৭১, পৃ - ১১৩ ।

৯। ঐ ।

নররূপী কৃষ্ণের মধ্যে পরমাত্মাকে শ্রীরাধার মধ্যে জীবাত্মা বা ভক্তকে প্রত্যক্ষ করা হয়। কৃষ্ণলীলার গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, অনুরাগ, মান, কলহান্তরিতা নানা পালা ও পর্যায়ের মধ্যে যে যে ঘটনা ঘটছে এবং যাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে — রূপকের দৃষ্টিতে কিন্তু সেই ঘটনাবলী ও সংঘটকগণ একদিকে যেমন লৌকিক বা সামাজিক নয়, অন্যদিকে তেমনি দুরূপত সত্তও নয়। পক্ষান্তরে সে সব ঘটনা ও চরিত্র একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার দ্যোতক। গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠের মধ্যে সৃষ্টির উদয় ও বিলয়, নৌকা বিলাসের মধ্যে ভব সমুদ্রে নিমজ্জিত জীবের শরণাগতি, বস্ত্রহরণের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেমের সকল বন্ধন বা পাশমোচন, পূর্বরাগে রূপ-গুণাদি দর্শনে শ্রবণে অর্থাৎ দ সৃষ্টির বৈচিত্রে মুগ্ধ জীবত্মার স্রষ্টার বা পরমাত্মার প্রতি প্রবল অভিমুখিতা, অভিসারে ঈশ্বর প্রাপ্তি পথে বাধাবিঘ্ন সঙ্কুল সাধনপথে সঞ্চরণ —— এই ভাবে কেবল মধুর রসের শুধু বিরহ-মিলনে বা বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের বিচিত্র পর্বেই নয়, মোটামুটি বৈষ্ণব পদাবলীর সর্ব পর্যায়ের মধ্যেই এই রূপক ব্যাখ্যার সূত্রগুলি সুলভ।'[১০]

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'জীব ও ব্রহ্ম' এই পারিভাষিক শব্দ দুটি খুব কম ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে ব্রজের কৃষ্ণলীলায় গোপী হলেন জীব এবং কৃষ্ণ হলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। রসরূপ ব্রহ্ম নিজের রস নিজেই আস্বাদন করেন, যিনি আস্বাদন করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ আর যাঁকে আস্বাদ করা হয় তিনিই শ্রীরাধা। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি, —" The Vaisnava Philosophers didt not much use the term Brahman and the term Jiva was also used very seldom. In their terminology the name Krsna stands for Brahman, and Gopi for Jiva which has entered into the sportive cycle of Krsna (Brahman)" [১১]

১০। ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী ও ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী। বৈষ্ণব পদ-নৈবেদ্য - ১৩৮৩, পৃ ৬৫।
১১। Dr. Sukumar Sen/ A history of Brajabuli Literature,

ভক্ত কবিগণ লৌকিক প্রেমের বৈচিত্র্য ও সাধারণ অলংকার শাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মাধুর্য্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অলৌকিক জগতে তত্ত্ব কথাকে মানুষী ভাষার রূপ দিয়েছেন।

শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, '' নর - নারীর ভিতরে সহজ প্রেমের যে দুইটি ধারা বহিয়া যাইতেছে তাহাকে নির্মলতম করিয়া আবার এক করিয়া দিতে পারিলেই ব্রজের যুগলপ্রেমের আস্বাদন লাভ হয়।'' [১২]

চণ্ডী দাসের একটি গানে পাই, —

'' প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা।।
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে
তখন রসিক যুগল দেখে।।''

এই দুইটি ধারার প্রতীক পুরুষ - প্রকৃতি বা কৃষ্ণ-রাধাকে সহজিয়ারা' রস' ও' রতি' বলেছেন। ' রস' শব্দের তাৎপর্য আস্বাদক রূপরস -স্বরূপ, আর রতি রসের বিষয়। এই' রস - রতি' নিখিল নায়ক - নায়িকার রূপ ধরে নিত্যকাল বিলাস করছে।

রবীন্দ্রনাথ রাধা -কৃষ্ণকে গভীর প্রেমাসক্তির রূপক বলে মনে করতেন। তিনি একসময়ে নবীনচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন —'' আমি ভাগবত খানিকে একটি খুব উচ্চাঙ্গের রূপক (allegory -) বলিয়া মনে করি।'' [১৩] আবার একবার তিনি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন ——'' পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তি সঙ্গত হেতু দেখা যায় না – যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ বন্ধন

১২। শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনের ও সাহিত্যে, ১৩৫১, পৃ - ২৮৫
১৩। ডঃ সুকুমার সেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড পূর্বার্দ্ধ, পৃঃ - ৩৮৮।

জড়িত নাই ———— এমন কি যাহা সমস্ত আত্মসুখ বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরহ দুরাশায় আত্মবিসর্জন করিতে যায়, বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শরূপক স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" [১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — বড়ু চণ্ডীদাসের '' শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'' বর্ণিত রাধা কৃষ্ণের দেহাশ্রিত প্রেমকে অনেকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারূপক বলে মনে করেন। সংসার মুখী রাধার মতই ''বড়ুআর বহুআরী আন্দো বড়ুআর ঝী।'' এই গর্বে উদ্ধত হয়ে শ্রীভগবানকে স্বীকার করতে চায় না। তখন স্বয়ং ভগবান আঘাত সংঘাতে জর্জরিত করে মায়ামুগ্ধ ভক্তের মর্ত্য - পিপাসা দূর করেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটিকে এখানে রাধা কৃষ্ণের রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এতক্ষণ 'বৈষ্ণবপদাবলীর' একটা সাধারণ আলোচনার পর উক্ত পদাবলীর কয়েকটি পদের বিশ্লেষণের সাহায্যে রূপক ব্যবহার লক্ষ করা সম্ভব হবে। গোবিন্দ দাস রচিত রাধার অভিসারের পদ ————

নীলিম মৃগমদে তনু লেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল।।
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু যামিনী ভয় ভাগি।। (১৪৫)

এখানে 'অনুরাগ' শব্দের দুটি তাৎপর্য। নীলরঙের পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের

১৪। ডঃ সুকুমার সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ - ৩৮৮।

প্রীতি গভীর অনুরাগের ফলে তাকে (গৌরাঙ্গীকে / গোরি) নীলিম (শ্যামরি) মনে হচ্ছে। পূর্বার্ধ গভীর কৃষ্ণানুরাগের ফলে রাধার হৃদয়মনদেহ আগাগোড়া শ্যামময় হয়ে উঠলো। চৈতন্য পরবর্তীকালে গৌরতত্ত্ব পর্যালোচনায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলিত (রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি) স্বরূপ চিন্তা এখানে কবিতে ফুটেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের কথাটি কুশল কবি গোবিন্দ দাস রাধার অভিসার প্রসাধনের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন।

বিদ্যাপতি রচিত'' এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি''। পদটিতে একদিকে মানবীয় প্রেমের আশ্চর্য অনন্যতা যেমন ফুটেছে, তেমনি এ প্রেম স্বরূপে যে দিব্য সে কথাও বলা হয়েছে।'' পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি'' পংক্তিতে ''রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি-হ্লাদিনীশক্তি' এই বৈষ্ণবীয় রসসিদ্ধান্তের জীবনানুগ লোকভাষ্য মিলেছে। বর্ষাঋতুর প্রবল আবির্ভাবের দ্বারা রূপকে চৈতন্যাশ্রয় বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি বিতরনের ছবি এঁকেছেন কবি নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে।

'' অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্যমেঘে
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে।'' (শিবানন্দ - ৩০১)

জল হৃদয়াবেগের রূপক। অতিরিক্ত আবেগের দৃষ্টি আবিল হয়, আবেগ প্রশমিত হলে উপলব্ধির সুস্থির মুহূর্ত আসে। তখনই অভীষ্টের প্রাপ্তি। তাই রূপানুরাগের কবির লেখনী থেকে নিঃসৃত হল,

'' বেলি অবসান কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায় ।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায় ।
যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব ওঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায় ।'' (১৩৪)

আক্ষেপানুরাগের একটি পদে নন্দের দুলালকে ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করে রূপকত্বের সৃষ্টি করা হয়েছে । ব্যাধের রূপের ফাঁদে '' আঁখি - পাখি '' আর ' মন - মৃগী '' ধরা পড়ল । তারপরে ' ধৈর্যহাতী ' থেকেই বিভিন্ন অলঙ্কার চিত্রে রাধার রূপকাকুল হৃদয়ের বিভিন্ন (ধৈর্য, দম্ভ, লজ্জা, ধর্ম ইত্যাদি) পরিচয় ফুটে উঠেছে ——

'' সজনি গো কেন গেলাম যমুনার জলে
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ।
দিয়া হাস্য -সুধা চার অঙ্গছটা আঠাতার
আঁখি - পাখি তাহাতে পড়ল ।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য - দেহ - পিঞ্জর রহিল ।
চিত্ত শালে ধৈর্যহাতী বান্ধা ছিল দিবারাতি
মত্ত হৈল কটাক্ষ - অঙ্কুশে
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দিশে ।''

রাজসভা কবি বিদ্যাপতি রূপানুরাগের নিম্নপদটিতে রূপকের মালা গেঁথেছেন যেন :—

'' হাথক দরপণ   মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন   মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ   গীমক হার।
দেহক সরবস   গেহক সার॥
পাখীক পাখ   মীনক পানি।
জীবক জীবন   হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে   মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ   দুহাঁ দোহুঁ হোয়। '' (১২৫)*

এই পদে পূর্বার্ধে বর্ণিত কৃষ্ণের উক্তি, মাধবই এখানে উপমেয়। রাধার কাছে এই মাধবের গুরুত্ব কতখানি বোঝাতে গিয়ে বিদ্যাপতির রাধিকা এই রূপকের মালা রচনা করেছেন। কৃষ্ণ তার কাছে হাতের দর্পন, মাথার ফুল, নয়নের কাজল, গ্রীবার হার এই ভাবে উত্তরোত্তর গুরুত্ব পরিমাপ জীবের জীবনের সমান হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব কবিগণের সকলেরই ভাবনা বৈষ্ণবধর্মের গোষ্ঠীরচেতনার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গুণে তাঁদের রচনা শিল্পগুণান্বিত হয়ে উঠেছে। চর্যাগীতিকার কবিদের সঙ্গে বৈষ্ণবকবিদের বড় পার্থক্য কবিত্ব প্রতিভায়। চর্যাগীতির কবিরা রূপক অলংকার ব্যবহার করেছেন, দীক্ষিতের কাছে ধর্মাচরণের গূঢ় রহস্য উপস্থাপিত করার জন্য। রূপক অলংকার ব্যবহারে যদি কোন কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিয়ে থাকেন তবে তা ধর্মাচরণের উপজাতমাত্র। কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের কবিত্ব তাঁদের

---

* দ্রষ্টব্য :- বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ধৃত পদগুলি ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী ও ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত ' বৈষ্ণব পদনৈবেদ্য '' গ্রন্থ হতে সংকলিত।

ধর্মনিষ্ঠায় উদ্ভূত নয়। বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব ছিলেন না সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। অন্যরা যদি বৈষ্ণব হয়েও থাকেন তবু তাঁরা ধর্মকে ব্যবহার করেছেন রস সৃষ্টির কাজে তাই তাঁদের হাতে রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার অত্যন্ত যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয় নি। এই বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাপতির '' সখি কি পুছসি অনুভবমোয়।'' পদটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য :— '' এখানে কোন একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমের ব্যর্থতা প্রকাশ পায় নাই, মানব চিত্তের সনাতন রহস্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্যটি এখানে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্তি, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান, সৌন্দর্যের খণ্ডিত আংশিক প্রকাশ হইতে উহার মূল প্রস্রবণের দিকে দুঃসহ অভিযান, রূপে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, অনায়ত্তের দিকে ব্যাকুল হস্ত প্রসারণ —— ইত্যাদি প্রকার প্রেমের দুরবগাহ মহিমা ও আকর্ষণের সুরটি এই কবিতায় যেরূপ আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিসমূহের মধ্যে স্থান লাভের উপযুক্ত। কীট্স - এর সৌন্দর্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও শেলীর আদর্শ সন্ধানে ঊর্ধ্বাভিযানপিয়াসী হৃদয়াবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড় একাত্মায় যুক্ত হইয়াছে।''[১৫] রাধাকৃষ্ণের রূপকত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান কবিগণ রচিত রাধাকৃষ্ণ পদের আলোচনা করতে পারি। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে মুসলমান কবিগণ রচিত রাধাকৃষ্ণ - পদ কোন বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নয়। যে জনপ্রিয় ভক্তি ধর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে সেই ভক্তি ধর্মই প্রকাশ লাভ করেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে সকল ' প্রেমপাগলিনী'র সঙ্গে রাধার একটা সুসাম্য আছে। মুসলমান কবিগণ অনেকেই — রাধা নিখিল প্রেম পাগলিনী — এই ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করে -

---

১৫। ডঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ - ২২।

রাধার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন ।

মুসলমান কবি আরকুম রচিত একটি পদ ,

'' আজ নিশাকালে রে সাঁই, আজ নিশাকালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে ।
ঘরের বাতি সারারাত্রি জ্বলে পালঙ্কে জলে,
দয়াগুণে প্রাণবন্ধু আইস রাধার কুলে ।''

— ... ...

পাগল আরকুম বলে শিশুকালে প্রেম না করিলে
না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ।'' *

জীবনের প্রভাত হতে প্রেমের পথে না চললে প্রেম সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী করে না নিলে জীবন নিশাতে কখনও প্রাণবন্ধুর তথা ভগবৎ প্রেমের দর্শন মেলে না — কবির বক্তব্যের তাৎপর্য যেন এখানেই ।

কোন কোন কবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে '' পাড়ী'' রূপে কল্পনা করেছেন । ভবপারের ব্যাকুলতা এবং অজানা ' পাড়ী'র কাছে আত্মসমর্পণ — বাঙালী চিত্তের এই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ' উম্বর' কবি তাঁর এই বিশেষ পদটিতে —

'' আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ।
প্রেম সাগরে ধাইলাম গো পাড়ি না জানি সাতার ।।
....
উম্বর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো
এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন ঘরে কর পার ।
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ।।''

বাংলা দেশের সহজ প্রেম - সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়েছে ।

---

* দ্রষ্টব্য :- আলোচ্য নিবন্ধে উদ্ধৃত মুসলমান কবিগণের পদগুলি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত ' শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে'' গ্রন্থ হতে সংকলিত ।

সে প্রভাব মুসলমান কবিগণও অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরাও স্বীকার করেছেন রাধা-কৃষ্ণের অভেদত্ব — ঘর-ঘরনী রূপে দুইয়ের লীলা। দেহ হ'ল ঘর, ঘরের মধ্যে জীব হলেন রাধা আর পরমাত্মা হলেন কৃষ্ণ। কবি ওহার লিখলেন,

'' বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার মনরে,
রাখ প্রানী দরশন দিয়া।
আমি নারী তুমি রে পতি একই পুরেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই খুঁজিয়া।।"

মুসলমান কবিগণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গানের মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে জড়িয়ে আছে। কবি সোনাম হুদনের একটি গানে আছে —

'' আকাঙ্খা কাষ্ঠের নাওখানি যমুনার মাঝ।
কাণ্ডারুরা কালা নিশান শুধু রাধার সাজ।।''
আখির মাঝে আখিগুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও।।
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায় দাঁড় বাইও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও।।
গলইর মধ্যে নায়ের পন্থরাই সর্পমুখে যায়।
সুপন্থ চলিলে রাধা হরির লাগ পায়।।''

এখানে 'নাওখানি' হল দেহ, যমুনা কাল প্রবাহ। 'আকাঙ্খা কাষ্ঠের নাও' অর্থাৎ যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেহ (অপক্ক দেহ) – সুতরাং তার 'কুরা' তথা নৌকা ঠেলিবার লগিও 'কাণ্ডা' অর্থাৎ আমজবুত।

কালো নিশান অবিশুদ্ধিরই প্রতীক । অতএব চিত্ত সংশোধিত করা প্রয়োজন । সুতরাং করনীয় কর্তব্য ' আখির মাঝে আখিগুলি রাখি নিরখিয়া চাও ' অর্থাৎ ' আবৃত চক্ষু: ' হও । ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখীনতার দিকে ইঙ্গিত করছে ' কর্ণের মাঝে কর্ণ ' পদটি । ' নায়ের মাঝে আছে হরি ' দেহের মধ্যে পরম দয়িতের অবস্থান । আর ' নাসিকায় দাউ বাইও ' নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জপের প্রতি ইঙ্গিত । ' মুখের মাঝে মুখ দিয়া ' কথায় ইঙ্গিত একান্তভাবেই তাদাত্ম্যের প্রতি । ' গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ ' দেহমধ্যস্থ নাড়ীচক্র সাধনার ইঙ্গিত করছে, আর ' সর্পমুখে ধায় ' কথাটি সাধকগণের উল্টাসাধনা বা ঊর্ধ্ব - সাধনা ব্যঞ্জনা দিচ্ছে ।

ছৈয়দ আলীর একটি গান এইরূপ ——

'' এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ।। ...
রূপের ঘর রূপ জ্বলতেছে বিনা চক্ষে দরশন ।।
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ
আগির মোকাম ধুড়ি ত্রিপুন্নিতে দরশন ।।''

' রূপের ঘর রূপ ' ই হল স্বরূপ , তাকে ' বিনা চক্ষে দরশন ' —— অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই স্বরূপ কেবল বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য । বাইরে দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হলে এই সাধনা সম্ভব নয় । দেহস্থ ত্রিনাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) সঙ্গম যেখানে সেখানেই বেনীমাধব কৃষ্ণের দর্শন মেলে ।

মুসলমান কবিগণের রচিত পদ আলোচনায় এমত উপলব্ধ হ'ল যে কোন গোষ্ঠি বদ্ধ চেতনা নয়, একটা বিশেষ তত্ত্ব ভাবনায় ভাবিত মুসলমান কবিগণ তাঁদের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার অনিবার্য বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন রূপক অলঙ্কার । ফলে এক্ষেত্রে ও ' রূপক ' গুলি যোগসাধনার তত্ত্বদ্বারা সীমাবদ্ধ হয়েছে ।

অন্যান্য সাধনসঙ্গীতের ন্যায় শাক্তসঙ্গীতও ভক্ত কবির মাতৃমহিমার বন্দনা গান। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে রাজানামধারী স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচারে দেশবাসীর গৃহজীবন বিপন্ন, মাঠের ধান ঘরে তোলার আশা লুপ্ত, কুলবধূর সতীত্ব বিঘ্নিত এবং যখন প্রবলের হাতে দুর্বলের লাঞ্ছনা অনিবার্য তেমন এক মাৎস্যন্যায়ের কালে শাক্তগীতিগুলির জন্ম। এ কারণে শাক্তসঙ্গীত মাতৃমহিমার গান হয়েও রূপচিত্রে সমাজজীবনের একটি স্বতন্ত্র দিক উদ্ঘাটিত করেছে। আমরা চর্যাগীতি ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যে রূপক অলংকার ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ করি সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন রামপ্রসাদ সেন ও তাঁর সহযোগী কবিবৃন্দ।

বিপন্ন সমাজের আর্তনাদকে মূর্ত করে তোলার প্রয়োজনে যে শাক্তগীতি রচিত হয়েছিল তা প্রবঞ্চিত মানুষের ভোগস্বপ্নের রূপক যেন। চাষের কথা, পাশাখেলা, মাছধরা, ঘুড়ি - ওড়ানো ভূমিস্বত্ব পাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় এবং প্রমোদমূলক স্মৃতির উপাদানে এ গীতির রূপকগুলি নির্মিত। ডিক্রি ডিস্মিস্, তহবিল - তছরূপ, হিসাবের খাতা ইত্যাদি বৈষয়িক জীবনের রূপানুষঙ্গ একাব্যে প্রতিফলিত।

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।।"

পদ রত্নভান্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে পারি। ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।

রামপ্রসাদের এই পদটিতে দেবশরণাগতির রূপকে হৃতসর্বস্বের জন্য বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি দেবীর উদ্দেশ্যেই নির্মম ভাগ্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অর্পণ করেছেন রূপকের আশ্রয়েই। –

ক) "মা গো তারা ও শঙ্করী
কোন অবিচারে আমার উপর করলে দুঃখের
ডিক্রী জারি।"

''এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছে করে ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি।''

খ) ''মায়ের এমনি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে।।
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালতে শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব করব কিনা, বুদ্ধি নাহিক আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে।।''

পদগুলিতে মানুষের কথা এবং সাধকের কথা একই সূত্রে বিধৃত হয়ে একদিকে জননীর কাছে সন্তানের আবেদনে, অন্যদিকে পরমারাধ্যার কাছে সাধকের আত্মনিবেদনে প্রকাশিত। তাই এ রচনায় ষড়রিপু, পঞ্চেন্দ্রিয় ভবতাপ, বাসনামুক্তি ইত্যাদি যোগ পরিভাষা, জমপেয়াদা, উকিল, আদালতের শুনানি, সওয়াল জবাবে জয়লাভের আশা ইত্যাদি রূপকে রূপান্তরিত।

তৎকালে প্রচলিত পাঁচটি খেলা - শতরঞ্চ, পাশা, দাস, ঘুড়িওড়ানো ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদির রূপকে সাধন-সঙ্গীতগুলো রচিত। এর থেকেই প্রমাণিত হয় জীবনের ব্যাপকতম পরিধি থেকে শাক্তপদাবলীর কবিগণ রূপক অলঙ্কারের উপাদান আহরণ করেছিলেন।

''এবার বাজি ভোর হ'ল।
মন কি খেলা খেললি বল।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমার দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল।।
দুটো অশ্ব, দুটো গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'ল।।''

সাধক কবি রামপ্রসাদ দাবা খেলার রূপকে আপনার অস্থিতির কথা বুঝিয়েছেন উক্তি পদটির মধ্যে ।

শাক্তকবি যেহেতু ভক্ত সাধক সেকারণে তাঁদের ভাবনা তত্ত্বকথায় আচ্ছাদিত । তবু লোকজগতের তুচ্ছ উপকরণের প্রতি কবিদের যে প্রবল মনোযোগ সেটুকুই কবিকর্মের সৌন্দর্য ফুটিয়েছে । ''কবির আন্তরিকতা, সাধকের বিশ্বাস, প্রতীক নির্বাচনের সার্থকতা ও রূপক পরিণতির সার্থক রূপায়ণ পদগুলিকে কবিত্ব মণ্ডিত করেছে ।''[১৩]

মমতায় গড়া প্রতিবেশন একদিন দুঃখে দুর্যোগে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল বলেই, বাঞ্ছিত স্মৃতিভাণ্ডার আলোড়িত করে এসব নিত্য বিষয়গুলো উপমালোকে প্রত্যক্ষ হয়েছিল । তাই সাধক কবি গেয়েছিলেন —

''মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানিব জমি রোলো পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা ।''

<u>অথবা</u> '' কালী পদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়াতেছিল ,
কলুষ কুবাতাস খেয়ে ঘুড়ি
গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল ।।''

<u>অথবা</u>'' ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী
মারে ।
সে যে সময়শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে
পরে ।।''

১৩। ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য | রামপ্রসাদ - জীবনী ও রচনাসমগ্র ১৯৭৫
পৃ - ৮২ ।

শাক্তসঙ্গীত যেহেতু সাধনসঙ্গীত সেকারণে এই পদগুলির একটি বড় অংশ হেঁয়ালিধর্মী ।" এগুলির হেঁয়ালি খোলসের অন্তরালে সাধকের সাধনসত্তা লুক্কায়িত । কবির সাধন পদ্ধতির চেয়ে সাধনপথের নানা বাধাবিঘ্নের কথাই এগুলিতে ব্যক্ত । কবি ষড়রিপুর বাধার কথাই অধিকাংশ পদে বেশি করে বলেছেন । এখানে পদের বাহ্যিক অর্থের অন্তরালে দ্বিতীয় একটি অর্থ রয়েছে । প্রথম অর্থটি সাধারণ পরিচিত জগতের । কিন্তু এই আবরণের ভিতরে রয়েছে তন্ত্র সাধনার গূঢ় তত্ত্বনির্দেশ । কবির সাধক - সত্তার পরিচয়ই এগুলিতে সুস্পষ্ট ।'' ১৭

যেমন : — ''ঘর সামল বিষম লেঠা ।
ঘরের কর্তা সে যে নয়কো আঁটা ।।
যার ইচ্ছে সে তাই করে ,
আপনা আপনি দেখে ঘোটা ।
এ ঘর নয় ঘোরে পুড়ে ,
করলে আমায় লাটা পাটা ।।
ঘরের গিন্নি পড়ে ঘুমায়,
দিবারাত্রি নাইকো উঠা ।
সে পাপী কি সাধে ঘুমায়,
যিণ্ডসর সঙ্গে আছে ঘোটা ।।''

আপাত দৃষ্টিতে একটি বিশৃঙ্খল ঘর সংসারের চিত্র । কিন্তু এর গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত । আধ্যাত্মিকতার ভাব আরও নিগূঢ় স্তরে পৌঁছেছে এই পদটিতে —

১৭। ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য | রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র ।
১৯৭৫ পৃ - ৮২ ।

''হৃৎকমল মধ্যে দোলে করালবদনী শ্যাম ।
মন - পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা ।।
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা ;
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা ।''

তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়ম নির্দেশ পদ্ধতি যা 'ষট্‌চক্রভেদের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত এখানে রূপকের আবরণে তারই পরিচয় রয়েছে । তবে অনেকক্ষেত্রে আবার রূপকের চিত্রশক্তি তত্ত্বভাবনাকে গোপন করেছে অনেকাংশেই । এ প্রসঙ্গে কমলাকান্তের একটি পদ উল্লেখ্য :—

''শুকনা তরু মুঞ্জুরে না, ভয় লাগে মা
ভাঙে পাছে ।।
তরু পবন - বলে সদাই দোলে । প্রাণ কাঁপে মা
থাকতে পাছে ।।
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে ।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন দ্বিগুণ
... ... আছে ।
জন্ম - জরা - মৃত্যুহরা তারা নামে বেঁধলে বাঁধে ।''

যোগ - নিরত সাধক চিত্ত এবং যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্ত - সাধকচিত্তের এই দুটি ভাবান্তর যা চর্যাগানের বৈশিষ্ট্য, শাক্তগীতিপদে তারই পুনর্দর্শন ।

তাই উপরিউদ্ধৃত পদটিতে দেখি রূপকচিত্রে বাস্তবের উপভোগ ফলের কথা । আর তারই অন্তরঙ্গ গোপন সিদ্ধি - ফলের আভাস । তৃতীয়স্তবকে ভোগবঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ । পঞ্চমস্তবকে ভোগজয়ীর চিত্তপ্রত্যয় । একই চিত্তে যোগনিয়ত ও যোগবিরত চিত্তের বিপরীত রহস্য ।

চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলীতে রূপক অলঙ্কার ব্যবহারের যে বহুলতা আমরা লক্ষ্য করি সেই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দীভাষার ভক্তকবি কবীরের কথা সহজেই স্মরণে আসে।

সাধক কবিরও তাঁর সাধনজীবনের কথা বলতে গিয়ে উপমা সংগ্রহ করেছেন বাস্তব সমাজজীবন থেকে। নৌকারোহণ, মদ্যপান, বর - বধূর মিলন ইত্যাদি বিষয় রূপক হিসাবে এসেছে তাঁর রচনায়। বাস্তবজীবনের উপমানের সঙ্গে সাধকজীবনের উপমেয় মিশে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তাঁত বুনতে বুনতে টানা পোড়েনে সুতো ছিঁড়ে বয়ন পণ্ড হলে তিনি গান –

''দীন দয়াল ভরোসে তোরে।
সভ পরবারা চঢ়াইআ বেড়ে।।''[১৮]

হে আমার দীন দয়াল, তোমার উপরই যে আমার ভরসা। প্রভু, তাই আমার সারা পরিবারকে তোমার নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।

নামরসে বিভোর নিরন্তর অবগাহনে কবি গেয়ে ওঠেন –

''অবধূ মেরা মন মতিবারা।
উন্মুনি চঢ়া গগন -রস পীবৈ ত্রিভুবন
ভয়া উজিয়ারা।
গুড় করি জ্ঞান ধ্যান করি মহুবা, ভব - ভাঠী
করি ভারা।
সুষমন -নারী সহজি সমাঁনী পীবৈ পীবনহারা
দোই পুড় জোড়ি চিগাই ভাঠী চুয়া
... ... মহারস ভারী।'' *

১৮। শশিভূষণ নাথ রায়। ভারতের সাধক চতুর্থখণ্ড - ১৩১৭ পৃঃ - ৭৫
* ডঃ উপেন্দ্র কুমার দাস। ভক্তকবীর ১৩৮৯ পৃঃ - ১১৭।

''পূরা মিল্যা তবৈঁ সুখ উপজ্যো তপকী তপনি বুঝানি ।
কহৈ কবীর ভব বন্ধন ছুটে জ্যোতি হি জ্যোতি সমানী ।''

ওহে অবধূত, আমার মন মাতাল হয়েছে । সমাধিমগ্ন হয়ে পান করছে গগনরস অর্থ শূন্য চক্রে প্রাপ্ত আনন্দ । ত্রিভুবন উজ্জ্বল হয়ে গেছে । জ্ঞানকে গুড় করেছে আর ধ্যানকে করেছে মহুয়া । সংসারকে ভাটি করেছে । দুই পাত্রের(জ্ঞান ও ধ্যানের) মুখ এক করে ভাটী থেকে চোলাই করা হচ্ছে মহাসুখরূপী (আনন্দরূপী)মদ । সুষুম্না নাড়ীরূপিনী নারী সহস্রের মধ্যে প্রবেশ করে এই রস পান করাচ্ছে । কবীর বলেছেন পূর্ণ মিলন হলে (অর্থাৎ সহজ সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হলে) সুখ উৎপন্ন; তপস্যার অর্থাৎ কৃচ্ছসাধনের তাপ দূর হয় । তখন ভববন্ধন টুটে যায় । জ্যোতির(পরমজ্যোতির) মধ্যে জ্যোতি (আত্মজ্যোতি) প্রবেশ করে ।

দুঃখের দহন ও প্রেমের মন্থনের পর সাধক জীবনে এসেছে প্রিয় মিলনের পালা । এবার তাঁর প্রেমাভিসার –

''ভীজৈ চুনরিয়া প্রেম - রস বুঁদন
আরত সাজকে চলী হৈ সুহাগিন
প্রিয় অপনেকো ঢুঁঢন ।''
... ...
পাঁচ তত্ত্বকী বনী হৈ চুনরিয়া
নামকে লাগে ফুঁদন ।
চড়িগে মহল খুল গঈরে কিবারিয়া
দাস কবীর লাগে ঝুলন ।'' ১১

অর্থাৎ প্রেমরসের ফোঁটায় ভিজে গেছে চুনরিয়া – বুটিদার ওড়না । প্রিয়তমের সন্ধানে প্রেমিকা চলেছে ব্যাকুল হয়ে । ওগো, তোমার চুনরিয়া, তাতে লাগানো হয়েছে নামের

১১। শঙ্কর নাথ রায় । ভারতের সাধক, চতুর্থখণ্ড ১৩৬৭ পৃঃ - ৮০

বানর । ওরে প্রিয়মহলে এবার ওই গিয়ে, দুয়ার যে তার গিয়েছে খুলে —
কবীর দাস তাই দেখেই আনন্দিত ।

প্রেমাভিসারের পর প্রিয়ের সঙ্গে মিলন হল মরমী সাধকের । প্রিয় মিলনের মধুর রস তাঁর জীবনে গাঢ় হয়ে ওঠায় মরমী কবি গাইলেন ,

''লিখালিখী কী হৈ নহী
দেখাদেখী বাত
দুলহা দুলহিনী মিলি গয়ে
ফীকী পরিবরাত ।'' ২০

— ওগো এতো লেখালেখি বা বর্ণনার কথা নয়, এ হ'লো দেখাদেখির কথা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা — বরকনে মিলে গেল আর ফিকে হয়ে গেল চারিদিকের বরযাত্রীর দল ।

কবীর যেমন বর ও বধূর রূপকে অবলম্বন করে ভগবান ও ভক্তের মিলনের কথা বলেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের রচনার কোথাও কোথাও এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে —

'' তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির বিরহুরা ।''
(গীতিমাল্য ৫২)

কবীরের এই প্রেমসাধনা শুধু অন্তরতমের সঙ্গে নিবিড় মিলনেই থেকে পড়ে নি , একীকরণ ও একাত্মকরণের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে —

২০। শঙ্কর নাথ রায় | ভারতের সাধক, চতুর্থখন্ড ১৩১৭ পৃ: - ৮১ ।

''উলটি সমরমা আপন্যে,
প্রগটি জ্যোতি অনন্ত ।
সাহেব সেবক একসঙ্গ
খেলে সদা বসন্ত ।''[২১]

অর্থাৎ সাধক কবীর এবার উলটিয়ে আপন সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । অনন্ত জ্যোতি সেখানে প্রকটিত, প্রভু-ভক্ত সেখানে এক হয়ে গেছে, আর চির বসন্ত রয়েছে বিরাজমান । এখানে সাধকের তত্ত্বভাবনা কবির রূপকসৌন্দর্য সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে ।

ব্যক্তিজীবন থেকে উপমা সংগ্রহ করে ভক্ত কবীর তাঁর ভক্তি নিবেদন করেছেন আরও একটি পদে । এই পদটিতে তিনি কুকুরের রূপকে গুরুর শ্রীচরণে প্রণিপাত হয়েছেন । —

" কবীর কুতা রামকা,
মুতিয়া মেরা নাউঁ,
গলৈ রামকী জেড়ী,
জিত খিঁচৈ তিত জাউঁ ।।
তো তো করে তো বাহুড়ৌ
দুরি দুরি করৈ তো জাঁউ ।।
জ্যুঁ হরি রাখৈ ত্যুঁ রহৌ,
জো দেবৈ সো খাউঁ ।।''[২২]

কবীরের রচনার যে সমস্ত নিদর্শন আমরা উপস্থাপন করলাম, তার সঙ্গে বাঙালী কবিদের পূর্বোদ্ধৃত রচনাগুলি তুলনা করলে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি । আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছি রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার মানুষের দেশকাল অতিক্রমকারী এক

২১। শঙ্কর নাথ রায় । ভারতের সাধক চতুর্থখণ্ড ১৩১৭, পৃঃ - ৮২ ।
২২। ঐ পৃঃ - ৮৩ ।

সাধারণ প্রবণতা। কবীরের দোঁহাবলীর সঙ্গে বাঙালী কবিদের পদসমূহের রূপকের ব্যবহার লক্ষ্য করলে সেকথা সমর্থন করতে হয়। লক্ষ্য করার বিষয় যেমন কবীরের ধর্মসাধনা, তেমনি সিদ্ধাচার্য, বৈষ্ণবকবি, ও শাক্তকবিদের ধর্মসাধনা অনেক পরিমাণে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্মসাধনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ধর্মশাস্ত্র মন্দির ও পুরোহিতকে অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভক্তির সেতু রচনা করতে চেয়েছেন। তাই মনে হয় শাস্ত্রবিগর্হিত ভক্তিকাব্য কবিদের আত্মপ্রকাশে এক বিশ্বজনীন মাধ্যম রূপক অলংকার। কবীরের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের এবং শাক্তকবিদের রচনা যদি আমরা তুলনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি স্পেনীয় ভাষায় লেখা —"St. John of the cross এর মরমীয়া কবিতাগুচ্ছকে তাহলে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা আরও জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। M.C. D'Arcy এই কবিতা গুচ্ছের রূপক ব্যবহার সম্পর্কে যা বলেছেন তা সমস্ত ভক্তিকাব্য বা মরমীয়া কাব্যের রূপক ব্যবহার সম্পর্কে বলা যেতে পারে, '' ... they are copper coins acting as currency for silver ''[১০]

ঈশ্বর সান্নিধ্যের অনুভূতি অনির্বচনীয়। অথচ কবিকে সেই রৌপ্যময় অনুভূতিকে প্রকাশ করতেই হবে (কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকাশেই কবিত্ব), ফলে তাম্রময় রূপকেই কবি নিরুপায় ভাবে ব্যবহার করেছেন।

আর মরমীয়া বা Mystic কবিগণ যে রূপক অলংকার বেশী ব্যবহার করেন তার কারণ বোধহয় তাঁরা প্রত্যক্ষ দিব্যানুভূতিকে বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ-গোচর করাতে চান।

১০। Roy Campbell কৃত Poems of the St. John of the Cross এর ভূমিকা, ১৯৫৬ পৃঃ - ৭।

রূপকের ব্যবহার লোক সাহিত্যে অপ্রচুর নয়, ধাঁ ধাঁ, প্রবাদ, লোককথা ও কথাসাহিত্য - যেগুলি লোক-সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ - সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে — উপমারূপকের ব্যবহার। এ প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : —

"The mythical story with its symbols has an element of permanency, for it brings before us, under a veil, the predicaments, the joys and the sorrows of human life; we begin to see why it is that folk-tales, these humble sisters of written art, still have power to stir our interest and even our feelings."

লোক সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। এই কারণেই লোকসাহিত্যের ভিত্তি চিরন্তন মানবিক বৃত্তি। বিশেষতঃ এর ভেতর দিয়ে চিরন্তন সামাজিক নীতি ও ধর্মের জয় ঘোষিত হয়। চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা সমূহও এদের মধ্য দিয়ে কৌশলে প্রকাশ করা হয়। বিজয়বসন্তের প্রতি তাদের বিমাতার যে বিদ্বেষের কথা বাংলা লোকসাহিত্যে শুনতে পাওয়া যায়, তা এক চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে রচিত। এই ভাবটি একটি স্বতন্ত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় লোকসাহিত্যে রচিত সিন্ডারেলার কাহিনীর ভেতর দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন লোকসাহিত্যের অনেক বিষয় সহজগম্য না হওয়ার জন্য রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে। যেমন —

''আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে ।।''

বর্তমানে এটি ছড়ারূপে শিশুমনে অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু এটি একটি সীমান্ত রক্ষক ডোমজাতির চতুরঙ্গের বর্ণনা। আগডুম অর্থ অগ্রবর্তী ডোম, বাগডুম পার্শ্ববর্তী ডোম, ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল।

১৪। R.M.Dawkins/Some Remarks on Greek Folk-tales, Folk-lore, 1948, P-68.

রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনে সমাজের অন্তর্লোকে যে লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল তাতেও রূপকসৃষ্টি হয়েছে। যেমন –

''ছেলে ঘুমান পাড়া জুড়ান বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।''

বর্গীর আক্রমণ বিষয়বস্তু অপেক্ষা এর মধ্যে শিশুর নিদ্রা যাবার উপযোগী যে একটি স্বপ্নধর্মী চিত্র ও মূলসৃষ্টি হয়েছে তার শক্তি বেশী এবং তার ভিতর দিয়েই এর আবেদন।

ধাঁধাঁ :-

ধাঁধাঁ ও প্রবাদ মূলতঃ রূপকাশ্রয়ী। একারণে রূপকের ব্যবহার এগুলির মধ্যে প্রচুর। রূপক অলঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের তুলনায় পার্থক্য থাকে না। উভয়ের অভেদ বা অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। ধাঁধাঁর মধ্যেও তাই হয়ে থাকে।

যেমন,
একটু খানি গাছে | রাঙা বৌটি নাচে – নওল।

এখানে রাঙাবৌ ও লাল নওলায় কোন ভেদ আছে বলে মনে করা হয় না। নওল ও বৌ-এর সাধারণ ধর্ম 'লাল' রঙটি বজায় থাকায় এবং উপমেয়কে গ্রাস করে উপমানের প্রধান হয়ে ওঠায় রূপকত্ব বজায় থেকেছে।

রূপকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য একটি বক্তব্যের বা অর্থের আড়ালে আরেকটি বক্তব্যকে বা অর্থকে আড়াল করে রাখা। ধাঁধাঁতে এই বৈশিষ্ট্য আছে।

যেমন :- (১) 'জলে জন্ম, স্থলে কর্ম, মালাকারে গড়ে
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয়, মাথার উপর চ'ড়ে।''
– টোপর।

(২) কাঁচায় তল তল পাকায় সিঁদুর ।
যে না বলতে পারে সে খেয়ে ইঁদুর ।।
— হাঁড়ি ।

(৩) হায় তরমুজ করব কি ।
বোঁটা নাই তার ধরব কি ।। — ডিম ।

(৪) বন থেকে বেরল টিয়ে ।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ।। — আনারস ।

(৫) বাঁকড়া বেঁকড়া গাছটী, জল ধরে তার বারোটী
পাকলে হয় একটী ।
— বারমাস, বছর ।

(৬) একটু খানি ডালে | কেষ্ট ঠাকুর দোলে — বেগুন ।

(৭) ঘরের ভেতর ঘর | মাঝে কনে বর — সুপারী ।

(৬) ও (৭) নং ধাঁধায় 'কেষ্ট' ঠাকুরের সঙ্গে ''বেগুনের এবং 'ঘরের' সঙ্গে 'সুপারী'র অভেদত্ব কল্পনা করা হয়েছে ।

কিন্তু কিছু পদ্যভিত্তিক ধাঁধার উদাহরণ পাওয়া যায় ।
কিন্তু এগুলি রূপকাশ্রয়ী নয়, শিক্ষামূলক প্রশ্নোত্তর মাত্র । যথা : -

(১) কোন সাগরে জল নাই ? — বিদ্যাসাগর ।

(২) কোন গাছের পাতা নাই ? — মিছ ।

(৩) কোন মাছের মাথা নাই ? — কাঁকড়া ।

অনেকে রূপকের ভিত্তি যে উপমা তার সঙ্গে ধাঁধার সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । রূপকের মত ধাঁধাতেও উপমেয় প্রায়ই উহ্য থাকে । যেমন : -''জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানের অন্ধকার অপনীত হয় ।'' — এখানে সূর্য শব্দটি উহ্য আছে।জ্ঞানের সঙ্গে সূর্যের

কোন ভেদ কল্পনা করা হয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে ধাঁধাঁ যদিই কি রূপক(Metaphor) অলঙ্কারের জন্ম হয়েছে ? একথা অবশ্য এরিস্টোটল বলেন নি তাঁর 'রেটোরিক' গ্রন্থে। তবে একথা সত্য ধাঁধাঁর মধ্যে রূপক অলঙ্কারের গুণ বর্তমান। তথাপি এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য — ধাঁধাঁয় উপমেয়টি সর্বদাই উহ্য থাকে, তা সন্ধান করে বার করাই ধাঁধাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপক অলঙ্কারে উপমেয় সর্বদাই যে উহ্য থাকে তা নয় এবং উপমেয়কে যথাযথ অনুভব করার প্রয়োজন হয়, তা না করতে পারলে রূপকের যথার্থ রস গ্রহণ সম্ভব হ'তে পারে না। লোক সাহিত্যবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ধাঁধাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Archer Taylor এর ধাঁধাঁ সম্পর্কিত মন্তব্যর উদ্ধৃতি দিয়েছেন — ইনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ধাঁধাঁ নিয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন। Taylor লিখেছেন, "Essential structure of the riddle consists of two descriptive elements, one positive and one negative - the positive element is metaphorical, in terms of the answer, though the listener is led to understand it in a literal sense. In contract the negative descriptive element is correctly interpreted literally."[১৫]

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনেকে এই মন্তব্যকে স্বীকার করতে পারেন নি। George এবং Dundes তাঁদের গ্রন্থে বলেছেন মন্তব্যটি 'inadequate'. তাঁরা দেখিয়েছেন Taylor নিজে যে ধাঁধাঁগুলি তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে বহু ধাঁধাঁর উপর তাঁর এই মন্তব্য আরোপ করা যায় না। সুতরাং ধাঁধাঁ থেকে রূপকের জন্ম একথা না

১৫। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলার লোক সাহিত্য, পঞ্চম খণ্ড ১৯৭১ পৃঃ -৫১৮।

বলে বলা যেতে পারে ধাঁধাঁ মূলতঃ রূপকাশ্রয়ী ।

প্রবাদ : —

'রূপক' অলঙ্কার লোক সাহিত্যের সকল বিষয়েরই একটি সাধারণ গুণ । এই রূপকের ব্যবহার প্রবাদের মত বাস্তব জীবনধর্মী বিষয়কে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়ে থাকে । যেমন 'অকালকুষ্মাণ্ড' — কথাটি দ্বারা অকালের স্বাদহীন কুমড়োকে নয়, গুণহীন অপদার্থ ব্যক্তিকে বোঝান হয়ে থাকে । ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাদে জীবনাচরণের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । যথা —'ধান ভানতে মহীপালের গীত' — ঐতিহাসিক ব্যক্তি মহীপাল বক্তব্যের লক্ষ্য নয়, এমন কি ধানভানা বিশেষ কর্মটির কথা ব্যক্ত করাও উদ্দেশ্য নয় । পদটির বক্তব্য রূপকমণ্ডিত । প্রকৃত অর্থ মূল্যবান বস্তুর অপপ্রয়োগ ।

সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ফল 'রূপক' । সেকারণে পরিণত এবং অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষের অভিব্যক্তি যে প্রবাদ তাতে রূপকের ব্যবহার প্রচুর লক্ষিত হয় । যথা —

(১) ''অকালে খেয়েছে কচু, মনে থেকো কিছু কিছু ।

— এখানে 'কচু' শব্দটি রূপক অর্থাৎ তুচ্ছ জিনিষ ।

(২) সোনার বেণে সোনা চেনে

স্বরাম চেনে কচু ।

— বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা ।

(৩) হাতিকে পেলে হাতকে খায়

বনে গেলে খেঁকশাল ভয় ।

— উভয় সংকটের কথা ।

(৪) হাটের হাণ্ডা মুড়ণ যায়,

মুড়ুণ পেলেই হাটুতে যায় ।

– ব্যক্তির আবিমূর্তকারিতার কথা বলা হয়েছে রূপকের আশ্রয়ে ।

লোককথা : –

ধাঁধা প্রবাদের ন্যায় লোকসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লোককথাও রূপকাশ্রয়ী । সামাজিক, ঐতিহাসিক, পারিবারিক অবস্থার কথা বর্ণনার অভিপ্রায়ে কথাকার রূপকল্পের সাহায্য নিয়েছেন । 'ডালিমকুমার ', 'কাঞ্চনমালা' ইত্যাদি লোককথা সমাজের বিশেষ বিশেষ কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ।

'ডালিমকুমার' লোককথায় বর্ণিত মৃত ডালিমকুমারের সঙ্গে বিধাতাপুরুষের ভগিনীকন্যার বিবাহ তৎকালীন সমাজের একটি দিক উদ্ভাসিত করে । তৎকালে পথী - যাত্রীর সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহ, মৃত ডালিমকুমারের সঙ্গে বিধাতাপুরুষের ভগিনী - কন্যার বিবাহেরই তুল্য । দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ''ঠাকুমার ঝুলিতে'' বর্ণিত 'কাঁকনমালা' ও 'কাঞ্চনমালা' কাহিনী দুটির এবং দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত 'কাজলরেখা' (মৈমনসিংহ গীতিকা) কাহিনীটির অভিপ্রায় অনুরূপ । প্রসঙ্গক্রমে আসে নাথ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার কথা । উক্ত গীতিকাদুটি লৌকিক কথাসাহিত্যের লিখিতরূপ । নাথ সঙ্গীত, শাক্তসঙ্গীতের ন্যায় সাধন সঙ্গীত । সেকারণে নাথ গীতিকার কবি বিশেষ একটি তত্ত্বদ্বারা পরিচালিত । সেই তত্ত্বকে কবিগণ প্রকাশ করতে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন ।

নাথকবি গান –

পুরু ঘীন নাথরে উল্টা উল্টা ধারা,
পুকুর ঘুরে ধান শুকাইয়া উপর তলে বাড়া ।
পুরা হে আমগাছে লৈলের পোনা বগায়
ধরি খায় ।
তা দেখিয়া ধুদি পিঁপড়া পল লইয়া যায় ।
পুরু হে, পাঁচপণ দিয়া কিনলায় নাও,
নয় বুড়ি তার জলই ।

কভু বনে রাখলাম নাও বেড়ে গিলল গলই ।
শুক্ত যে, একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপনীর ঘাটে ।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে ।

৩৩নং চর্যাপদের কবি ঢেণ্টনপাদ যেমন কতগুলি অবাস্তব এবং বস্তুতঃ অসম্ভব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে সহজিয়াভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি নাথগীতিকার কবিও অসম্ভব ঘটনার উপস্থাপনায় প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছেন । এসকল রচনায় তার অলঙ্কারত্ব বর্জন করে হেঁয়ালি হয়ে উঠেছে । অনুরূপ পদ ** মাহমুদ বিরচিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস্ গ্রন্থে ও শ্যামদাসের 'মীনচেতনে'ও পাওয়া যায় ।
শ্যামদাসের 'মীনচেতনে' আছে :

বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে ।
পখড়িতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে ।।
নগরে মনিষ্য নাই ঘর চালে চালে ।
অন্দরে দোকান দেএ খরিদ করে কালে ।। [২৬] — ২৫ পৃ

আর শুকুর মাহমুদ লিখেছেন,

''বাসাতে ছাও নাই সদাই উড়ে পড়ে ।
নগরেতে মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে ।।
পৈখরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন ডোবে ।
অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে ।। [২৭]

** বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মৈমন সিংহ গীতিকার অকৃত্রিমতা সম্পর্কিত তর্কে প্রবেশ করছি না ।

২৬। উল্লেখ্য — উদ্ধৃতি দুটি আবদুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত । গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত । ১৯৭৪ পৃ -১১৭ ।

২৭। ঐ

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া এরূপ আরও পদ সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে । ফয়জুল্লাহ রচিত 'গোরক্ষ - বিজয়' থেকে তিনি এরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন ।

''কাল ভাইএ শীদ গাহে বোবা ভাই রহি সুনে
টুটা হই যাদন সে বাহে ।''

অনুরূপ ভাবধারার একটি পদ পাই কাহ্নপাদ রচিত ৪০ নং চর্যায় – ''গুরু বোব সে সীসাকাল ।''

তবে একথাও সত্য দেহতত্ত্বের গান অনেকক্ষেত্রে শুচি ও সংযম রক্ষা করে সাহিত্য পদ - মর্যাদা পেয়েছে । এরূপ একটি পদ –

''নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন - ভমরা ।
জ্বালাইয়া দিলের বাতি, জাগি রব সারারাতি
(গো) ।
কব কথা প্রাণ বন্ধুর কানে, রে মন - ভমরা ।'' ২৮

উক্ত পদটিতে দেহকে ফুলবনের সঙ্গে মনকে ভমরার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে । জীবনে যখন সন্ধ্যা নেমে আসে তখন মনের ভ্রমর জেগে ওঠে অর্থাৎ চিত্ত সজাগ হয়ে ওঠে । অন্তরের আলো অর্থাৎ দিলের বাতি অনির্বাণ থাকে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং তখনই প্রাণরূপ বন্ধু তথা ভগবানের সঙ্গে নিভৃত আলাপনের অখণ্ড আসর ।

বিশেষতঃ এর তত্ত্বটি মানুষের 'ফুলান' সদৃশ পবিত্র সুন্দর দেহ আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে বলে এর মধ্যে একটা সর্বজনীন আবেদনও আছে । তত্ত্বকে প্রকাশ করার পরিবর্তে রূপক অলঙ্কার এখানে সাহিত্য সৌন্দর্যের সহায়ক হয়েছে ।

২৮। (মৌলভী সিরাজউদ্দীন কাসীমপুরী কর্তৃক ঢাকা জিলার নরসিংদি গ্রাম হতে সংগৃহীত ।
– ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য | বাংলার লোক সাহিত্য | প্রথমখণ্ড , ১৯৬২ পৃঃ ৫৭ ।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবীয় পরকীয়া তত্ত্ব এবং সহজিয়া ভাবসাধনার সঙ্গে সুফীমত সমন্বিত হয়ে বাংলাদেশে এক অপরূপ গীতি গড়ে উঠেছিল — সে গীতি ' বাউল গীতি' নামে পরিচিত। আর' বাউলগীতি' বাউল ধর্ম - সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। 'বাউল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '' ... সংস্কৃত'বাতুল' শব্দের প্রকৃত রূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার - ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম - সম্প্রদায় বাউল।''[২৯] মুহম্মদ এনামুল হক্ এর মতে, '' আউল বা আউলিয়া বাউল সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেনীর মুসলমান ফকির, — বর্তমানে' আউল' ও ' বাউল' এক হইয়া গিয়াছে।''[৩০] রবী-দ্রনাথ' বাউল' সম্পর্কে পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ——

'' ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তার আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে, নক্ষত্রখচিত আকাশে
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে
দোসর তনার মিলন বিরহের গহন বেদনায়।''(পত্রপুট)।

' বাউল' সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দেবার অভিপ্রায় এই যে বাউলেরাও যে প্রেমের সাধক সেকথা বোঝান। বাউলেরাও ভাবের ঘোরে, রসের নেশায় মত্ত থাকেন, সেকারণে তাদের গীত গানেই (' বাউল গান' নামে পরিচিত) তাঁদের সব কথা, সব তত্ত্ব ব্যক্ত হয়ে ওঠে। বাঁউল সম্প্রদায় বহির্ভূত কেউ যাতে তাঁদের ধর্ম ও সাধনার কথা সহজে জানতে বা বুঝতে না পারেন সেকারণে তাঁদের গানকে তাঁরা করেন প্রহেলিকাধর্মী,

---

২৯। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গবীণা, পৃ - ৪৫১।

৩০। মুহম্মদ এনামুল হক্। বঙ্গে সুফী প্রভাব, ১৯৩৫, পৃ - ১৮১ - ৯০।

ভাষাকে করেন ইঙ্গিত ও সঙ্কেত-ময় ।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাউলের ধর্ম সাধনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন ।- 'বাউল সাধনার প্রথম বিশেষত্ব তাঁদের যে সাধনা তা চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয় । এ সম্পর্কে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে আলোচনা করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য —'' বাউল কি চাহেন, তাঁহার ইষ্ট কি ? মানবদেহকেই বাউল একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং যোগসাধনার মধ্য দিয়া এই স্থূলদেহের মধ্যেই পরম সত্য ও সত্তাকে খুঁজিয়া চলিয়াছেন । এই পরমসত্যই তাঁহার ইষ্ট, তাঁহাকেই বাউল বলেন 'অচিনপাখী,' 'মনের মানুষ,' 'রসের মানুষ' বা 'ভাবের মানুষ'। বাউল কখনও ঈশ্বরকে চাহেন নাই, — প্রেম-রস-লীলাময় এই 'সহজমানুষ' বা 'অধরমানুষ' - কেই বারে বারে দেহের খাঁচায় আবদ্ধ করিবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিয়াছেন । সুতরাং বাউলের সাধনায় মানবদেহ হইল ভিত্তি, দেহই তাঁহাদের সাধনার অবলম্বন, দেহ তাঁহাদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ । দেহ ভাণ্ডকেই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, — ইহার মধ্যেই সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগর ও সপ্তদ্বীপ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা । এই দেহের মধ্যেই সেই 'অচিনমানুষ,' 'মনের মানুষ' - কৃষ্ণ', 'আল্লা,' বা 'সাঁই' এর নিবাস, এই দেহের মধ্যেই 'মহারস' বা আনন্দের অমৃতধারা প্রবহমান । পরমতত্ত্ব মন্দিরে নাই, মক্কায় নাই, — দেহই দেউল, দেহই 'কাবা'। ৩১

বাউল যেহেতু প্রেমের সাধক সেহেতু তাঁদের গানে প্রেমের দুটি দিক বর্তমান । একদিকে ভালবাসার ঘরোয়া আবেগ । অন্যদিকে সাধকের নির্জন অনুভূতির মধ্যে অরূপতত্ত্বের অনির্দেশ্য পুলকাবেশ । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —

---

৩১ । ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ও গুরুসদয় দত্ত । শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত , ১৯৬৬, পৃ -১০০ ।
দ্রষ্টব্য :-(বাউল সম্পর্কে)- ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ - ১৩১৮)পৃ- ২০১-২০৫ ।

'' সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চির পরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো''। (পত্রপুট)

এ হ'ল বাউল গানে ঘরোয়া ভালবাসার দিক। তাছাড়া, —

'' ভালবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বাহিনী।'' (পত্রপুট)

অরূপতত্ত্বের আশ্রয়ে ভালবাসার' অসীম শ্রীলোক' উদ্ঘাটিত।

বাউলেরা যেহেতু 'সহজিয়া' সাধক সেকারণে তাঁরা সমাজজীবন থেকে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে ভালোবাসেন। তাঁদের নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে এবং চোখের দৃষ্টিতে গৃহ জীবন ও সংসারের প্রতি প্রবল উপেক্ষার ভাব ফুটে উঠে।* ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদনের উপায় তাঁদের স্বতন্ত্র '' Baul represents more a spirit of unconventional approach to divinity through unassumed love and piety than any precise relivious cults" [৩২] বৈষ্ণব সহজিয়াগণ পরকীয়া প্রেমের দ্বারা ভক্তি নিবেদন করেন। 'রাধাকৃষ্ণ' তাঁদের কাছে ভক্ত ও ভগবান। রাধা-হৃদয়ের বিচিত্র বেদনার অভিব্যক্তি প্রদর্শন তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাউলসাধক ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরমসত্তার সঙ্গে প্রেম করে থাকেন। সেই কারণে তাঁদের কাছে, 'রাধাকৃষ্ণ' রূপকমাত্র। আপন সাধনার তত্ত্বটিকে রূপকমণ্ডিত করতে বৈষ্ণবীয় ঘটনা কাহিনীকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। যেমন : —

(ক)- আ মরি কি রূপের ছটা,
কয়লা হতেও ময়লা সেটা, (হায় লো)
তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা, লাজে মরে যাই লো।।
আঁকা বাঁকা অর্ধখানা, ভঙ্গী দেখে মন ভুলে না, (তায় লো)
দাস নীলাম্বরে সেই সাধনা, করিছে সদাই লো।। (হারামণি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

---

* দ্রষ্টব্য :- ক্ষিতিমোহন সেন : বাঙলার বাউল, ১৩৫৪, পৃ - ৫০।
৩২। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত: Obscure Religious Cults, 1962, P-160.

বাউল গায়কের বক্তব্য কালারূপের রহস্য ও আকর্ষণ যেমন একজন নায়িকাই বোঝে, তেমনি অরূপমূর্তির সন্ধান নিভৃত একটি মনই পায়।

(খ). '' ওগো রাই- সাগরে নামলো শ্যামরায়
তোরা ধর গো হরি ডেসে যায় ॥
রাই প্রেমের তরঙ্গ ভারি
তাতে থাই দিতে কি পারবেন গো হরি
যোড়ে রাজ্য, প্রেমে উদাস
দুঃখের চিন্তা কেঁতা ওড়ে পায় ।।'' (লালন গীতিকা)

ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী পদটিকে জ্ঞানদাসের 'আক্ষেপানুরাগের পদ' 'সুখের লাগিয়া - এঘর বাঁধিনু' পদের লোক সংস্করণ বলেছেন তাঁর 'বাংলা-কাব্যের উপমালোক' গ্রন্থে। এখানে নায়িকারূপে ভক্ত হৃদয়ের আপন উপাস্যকে না পাওয়ার ব্যর্থতা প্রকাশিত হয়েছে। পদটি প্রেমিকার হৃদয়- নৈরাশ্যের ছবি, আর তারই অন্তরালে সাধকের আকৃতি।

বাউল সাধক তাঁদের সাধনতত্ত্ব প্রকাশ নিমিত্ত অন্যান্য সহজিয়া সাধকদের ন্যায় আটপৌরে বাস্তব সমাজজীবন থেকেই উপমা - রূপক গ্রহণ করেছেন। ''তাহাদের ভাবানুভূতি স্বতঃ উৎসারিতভাবে যে রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহাই তাহাদের রচনার শোভারূপ। ... এই রচনায় উপমা বা রূপকের বিষয়গুলি তাহাদের চারিদিকের দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তু হতে সংগৃহীত, নিতান্ত আটপৌরে ভাষায় – সময় সময় আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তাহাদের ভাবানুভূতি রূপ লাভ করিয়াছে।'' ৩৩ যেমন :—

'' কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন থাকবি ঘরে
ঘোমটা খুলে চলনারে যাই সাধ - বাজারে।
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।'' (লালন গীতিকা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৩৩। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউলগান, ১৩৬৪, পৃ - ১১০।

পদটিতে একদিকে ঘরোয়াছবি অন্যদিকে অরূপতত্ত্বের ইঙ্গিত প্রস্ফুটিত। কুলের বধূ সমাজ রীতি ও দেহ-সংস্কারের ঘোমটায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে স্বাধীন হৃদয়ে তাঁকে সংযত করে রাখে। বাউল সখীর ন্যায় আপন মনকে বুঝিয়েছেন 'মনের মানুষ'কে পেতে হলে ঘোমটা ও কুলের বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং কুলের বধূর গোপন অভিসারের মতই অভিসার করতে হবে।

লালনশাহ, পাঞ্জশাহ, দুদু, গোঁসাই গোপাল, কুবির গোঁসাই হাউড়ে বা যাদুবিন্দু তাঁদের গান বানাবার সময় চিরকালীন বাংলা সৃজনধর্মের ভাবপ্রাধান্যকে উপেক্ষা করেন নি। সেই জন্যই এঁদের গানে রূপক অলংকারের এত বর্ণাঢ্য বিস্তার। উদাহরণ স্বরূপ কুবির গোঁসাইয়ের পদ লক্ষনীয়:—

''আবাদ কর জোঁদ পোড়া জমি লয়ে
থাকো রে মন
থাটো কৃষাণ হয়ে
মন রে জোড়ো ধর্ম হাল প্রবর্তক ফাল
সাধক জুড়ায় সিদ্ধি ইষ লাগাইয়ে
জোড়ান দিয়ে রিপুর স্কন্ধ
লাঙল জোড়ো সাবধে বেয়ে যাও প্রেমানন্দে

এই গানের রূপ-রীতিতে বাংলা দেহ তত্ত্বের গানের চিরন্তন ঐতিহ্য মিশে আছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে এই যে প্রকৃত জীবনের রূপককে গীতিকায় টেনে এনেছেন তার মধ্যে রয়েছে বাঙালীর নিজস্ব ভাবুকতা। দেহতরী, দেহতরু, মন-মাঝি, দশেন্দ্রিয়, ষড়রিপু, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, রূপসাগর মনের মানুষ প্রভৃতি রূপক ও প্রতীক বানাতে বাঙালী লোক গীতিকার যেমন দক্ষ, শ্রোতারাও তেমনই নিপুণ ভাবগ্রাহী। মাছধরা, জমি চাষ করা, খেজুর গাছ কাটা, গুর তৈরী প্রভৃতি পল্লীবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক

ব্যাপারগুলোকে বাউল কবি সাধনতত্ত্ব ও সাধনজীবনের অবস্থা বর্ণনার রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মহাকাব্য - এর কাহিনীর রূপকে বাউল তত্ত্বের কথা বলেছেন,

'' এ মায়া সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে ।

আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহেতে ।

আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন ।

আমার বধিতে আইল প্রাণ অন্যায় যুদ্ধেতে ।।

কামকর্ণ মহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর —

হ'লাম ক্রোধ - দুঃশাসনের দুষ্ট শাসনেতে

ঘিরেছে লোভ - শকুনি, মোহ - কৃপ,

মদ - অশ্বত্থামাতে । ইত্যাদি ।

এই পদটিতে তত্ত্ব কথা প্রকাশই প্রাধান্য লাভ করায় এবং উপমেয় - উপমানের সহাবস্থান ঘটায় রূপক ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত । মনকুমতি দুর্যোধন, কাম - কর্ণ, লোভ -শকুনি, মদ - অশ্বত্থামা ইত্যাদি রূপক এত স্পষ্ট যে রূপকের যে উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি তা বিঘ্নিত হয়েছে ।

জমির সঙ্গে মানবদেহের তুলনা বাউল গানের বহু প্রচলিত প্রথা । কালাচাঁদ বাউল গেয়েছেন,

''মানবদেহ কল্পভূমি | যত্ন করলে রত্ন ফলে ।
তবে আমার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করলে ।''

শিলাইদহের বাউল গোঁসাই গোপাল বলিতেছেন :

''অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র যে করে উদয়,

স্বর্গ - মর্ত্য - পাতালে তিন ধামেতে হবে জয়,

সামান্যের কর্ম নয়, সাধিলে সিদ্ধ হয় ।''

ঘোর অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার বিকাশ ঘটানো তথা কামকে ঊর্ধ্বগতি করে প্রেমে পরিণত করা বাস্তবিকই কঠিন সাধনা — তাতে বিজয়ী সাধকের জয় ঘোষণা ত্রিভুবনব্যাপী

হবে তাতে সন্দেহ থাকে না।

বাউলের ইষ্টদেবতা তাঁর 'মনের মানুষ' তাঁরা কখনই প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে চান নি, সর্বত্রই চলেছে তাঁদের এই 'মনের মানুষ'কে খোঁজা। 'মনের মানুষ' অন্য কিছুই নয়, ভক্তেরই আপন বিশুদ্ধ সত্তা। সেকারণেই তাঁদের ব্যাকুলতা —

" খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তার পায়।''
(লালন ফকির / গানসংকলন — ৮৭)

রবীন্দ্রনাথ মনের মানুষ সম্পর্কে লিখেছেন, "... their God is the Man of the Heart (manner manush) sometimes simply the Man (Purush). This Man of the Heart is ever and anon lost in the turmoil of things, Whilst the is revealed within, no worldly pleasures can give satisfaction. Their sole anxiety is the finding of this Man."৩৪

''আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যেরে।''

বাস্তবিকই বাউল কবি কখনও পূর্ণ প্রাপ্তিকে স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মনে চিরদিনই ক্ষণকালের পাওয়ার পর চিরতরে হারানোর বেদনা বেজেছে। যেমন,

''পাখী কখন যেন উড়ে যায়।
বদ হাওয়া লেগেছে খাঁচায়।।
খাঁচার আড়া প'ল ধসে।
পাখী আর দাঁড়াবে কি সে,
এখন আমি ভাবি বসে, —
সদা চমক - জ্বরা বহে গায়।।''
(লালন ফকির : গান সংকলন ৩২)

৩৪। রবীন্দ্রনাথ - : The Religion of Man, 1958, P.216.

এ যেন বিদ্যাপতির ''দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'' এ বিষয়ে গুরু সদয় দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃতি যোগ্য : — "The quest can never end because the Beloved, although felt to be dwelling in the same body as the seeker's, ever eludes complete union, and the intoxication of this perpetual search and pursuit of the Beloved, who is always felt to be very very near but just outside reach, fills the Baul with a never-ending madness." ৩৫

'মনের মানুষের' সঙ্গে বাউলের সম্পর্ক লীলার আনন্দময় ও প্রেমের। তাই এই 'মনের - মানুষ' একদিকে যেমন 'প্রেমিক' অপরদিকে তেমনি 'পাখী'। তনুর খাঁচায় এই অধরাপাখী থেকে থেকে ধরা দেয় বটে, কিন্তু সেই ধরার আনন্দ প্রাপ্তির বিন্দুতে পৌঁছাবার আগেই আবার অধরার জগতে উধাও হয়ে যায়। পাবার ক্ষণপরেই হারাবার বেদনা এ জাতীয় গানগুলিকে এক কারুণ্যময় আনন্দে ভরে দিয়েছে। বাউল - কবি 'মনের মানুষ'কে বিচিত্র ও বিভিন্ন সম্বোধনে বিশেষিত ও সম্বোধিত করেছেন। যেমন তাঁকে বলেছেন, 'অচিনপাখী', 'ভাবের মানুষ', 'রসের মানুষ', তেমনি আবার 'সোনার বউ', 'সুন্দরী দিদি' বলে সম্বোধন করেছেন। কোথাও স্বামী স্ত্রীর রূপকে ভেবেছে 'মনের মানুষ'কে যেমন : —

''আমি নারী তুমি রে পতি
একই গৃহেতে বসতি
ঘরের পুথী না পাই খুঁজিয়া।''
(ওহাব)

বাউল গানে যে কেবল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে একথা সর্বত্র সত্য নয়, কোথাও কোথাও তত্ত্বকে অতিক্রম করে বাউল সাধনসঙ্গীত সাহিত্য পদমর্যাদা পেয়েছে। পরবর্তী গীতি কবিতায় যে স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা মাধুর্য লক্ষ করা যায় নিম্নোদ্ধৃত বাউল পদগুলিতে যেন তার

৩৫। গুরুসদয় দত্ত : The Folk Dances of Bengal, 1954, P-72.
ডঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী ও গুরুসদয় দত্ত সঙ্কলিত ১৭৬ ও ১৭৭ সংখ্যক গান : শ্রীহট্টের লোকসংগীত। ১৯৬৬।

পরিচয় মেলে।

<u>উদাহরণ :-</u> (১) হাওয়ায় গাছ, হাওয়ায় পাত
হাওয়ায় ফুটে ফুল।
ওরে সেই ফুল চিনিতে পারছ'ন
মোহাম্মদ রসুল।
(সংকলন - ২০৩)

(২) ফুলের মাঝে মজিয়া থাকিয়ো তুমি –
ফুল তুড়িয়া মধু খাইয়ো ;
এগো, ঝাঁকে ঝাঁকে ভমরা আইয়া
মধু লইয়া উড়িয়ো।। (সংকলন - ২০৩)

<u>অথবা</u>

''হেতু সম্বন্ধ নাইরে তার
করে নি হেতু প্রেম বেচাকেনা।
ফলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে সে
সেই ত রসিক জনা।''
(হারামণি ১ম খণ্ড)

ফলের আশা নয়, শুধু ফুলের মধু পান - এ এক অপূর্ব তত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে ''বাউল গান তত্ত্বেরই গীতায়ন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সুরের যোড়কেই কেবল মোড়া নহে। ব্যক্তিগত অনুভূতি উহার প্রধানতম ঐশ্বর্য – ... ইহার রচনাভঙ্গী ও সুর - রূপের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট হৃদয়স্পর্শী আবেদন রহিয়াছে, — সম্প্রদায় নির্বিশেষে রসিক পুরুষ তাহাতে নাড়া খাইবেন। বাউলের রূপক - উপমা, তাঁহার রোমান্টিকতা ও মিষ্টিকতা অর্থাৎ নৃত্য - গীত বাদ্য - গানের এই ললিত দিকগুলিকে বাদ দিয়া কেবল কথাকে গ্রহণ করিলেও অনেকে সাহিত্য - স্বাদ পাইতে পারিবেন।''[৩৭]

৩৭। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ও পুরুষোদয় দত্ত : শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত ১৯৬৬, পৃ - ১৪৩।

শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাউলগানে'র আবেদন সম্পর্কে লিখেছেন, " বাউল গানগুলিতে মনের সহজ অনুভূতি, সহজ সত্য, গভীর ঈশ্বরোপলব্ধির কথা কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । ... বাউল গানের সুর এমনই যে, উহার সুর ও কথা উভয়ে মিলিয়ে মানুষের মনকে একটা অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় ।'' ৩৮

বাউল গানের আলোচনা প্রসঙ্গে আসে মোমেনশাহীর ফকিরানী গানের কথা । গানগুলি 'হালকার গান' নামে প্রচলিত । হালকার গান বিভিন্ন রকমের তবে অধিকাংশ গান বন্ধু হারা রূপক । সে বন্ধু কোথাও পীর, কোথাও আল্লাহ্, কোথাও রসুল, পীরের একটু কৃপাকণা লাভের জন্য নিদারুণ উদ্বেগে দিন কাটাতে হয় ভক্তকে । সাধনরাজ্যের শুভক্ষণের জন্য যে তার প্রতীক্ষা । সমগ্র দেহরাজ্যেই তাঁর পরমসত্যের (মুর্শিদের) স্বরূপ বিকশিত হয় । একটি রূপকের মধ্য দিয়ে সে কথাই বলতে চেয়েছেন হালকাগানের কবি ।

''আয় না পিয়া নদীর কূলে
জোয়ার আইলে বরশী বাই ।।
মারতে আইলায় রুই - কাতলা
নইলে শিং - এর গালা খাই ।
বড়শীত্ আমার নাইরে সীমা,
টুপ দিয়া মুই পাইনা দিশা ,
ফুরাইলো মোর পুড়া ইচ্ছা
বৈকালে নিরামিষ খাই ।'' ৩৯

আর বিস্তৃতআলোচনা নয়, আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রূপক অলংকার ব্যবহারের পর্যালোচনা সমাপ্ত করছি এখানে । এই পর্যালোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান

৩৮। শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৩৬৮, পৃঃ - ২৮

৩৯। রওশন্ ইজদানী : মোমেনশাহীর লোক - সাহিত্য ১৯৬৮, পৃঃ - ২০ ।

হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত রূপক কাব্যধারার বীজ এই সমস্ত রচনার মধ্যে নিহিত ছিল। যে মানসিক প্রবণতায় রূপক অলংকার ব্যবহৃত হয়, বিমূর্তভাবকে মূর্ত করার আগ্রহে, সেই প্রবর্তনায় যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রূপক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছিল, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রূপক কাব্য লিখিত হয়েছিল। তবে প্রাগাধুনিক যুগে দীর্ঘ পরিধিতে বা সার্থ রূপক কাব্য লিখিত হয় নি। বড়জোর দু-তিনটি রূপকের ব্যবহারে একটি ধর্মাশ্রিত গীতিকবিতা লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে প্রথম থেকে শেষ অবধি সমান্তরালভাবে প্রসারিত একদিকে গূঢ়ার্থ অন্যদিকে আপাতঃ অর্থের বিন্যাস ঘটে নি। এই যে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত রূপকের মালা সাজিয়ে 'সার্থ রূপক কাব্য' ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত হ'ল, সেটা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে, কিন্তু পাশ্চাত্য Allegorical Poems - এর প্রভাবে লিখিত হ'ল পরবর্তী অধ্যায়ে সেটিও আমাদের আলোচনার বিষয়।